ভগবান বুদ্ধ

স্বামী কৃতার্থানন্দ

''জরাব্যাধিকিল্বিষাণাং প্রাদুর্ভূতো ভিষগ্‌বরঃ।
নমোঽস্তু বোধিসত্ত্বায় সম্বুদ্ধায় নমো নমঃ॥''

দুঃখ ও তার প্রতিকার

সংসারে সকলেরই অতি পরিচিত অভিজ্ঞতা হল দুঃখ। দুঃখ এক অমোঘ সত্য। আমরা সবাই কম বেশি দুঃখ ভোগ করেছি ও করব। ক্ষণিকের সুখে মজে অনেকে ভাবে, দুঃখকে 'ফাঁকি' দেওয়া গেল। কিন্তু তা হয় না। মহাপুরুষদের মতে জগতে দুঃখই বৃহত্তর সত্য ও শিক্ষাপ্রদ, মাঝে মাঝে সুখ হল ছোট্ট ফুটকির মতো। তা মানুষকে সাবধান হতে শেখায় না, বরং আরও মোহগ্রস্ত করে। তাই সব অভিজ্ঞতাকে ছাপিয়ে মানুষের হৃদয়তন্ত্রীতে একটি ঝংকারই বাজে—দুঃখ আছে।

তবে দুঃখের অভিজ্ঞতা সবার হলেও তার প্রতিক্রিয়া সকলের ক্ষেত্রে সমান হয় না। এই প্রতিক্রিয়ার রূপ মোটামুটি চার রকমের হয়ে থাকে। কেউ কেউ দুঃখ সইতে সইতে কোনওরকমে তার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেয়; কেউ বা দুঃখ পেতে পেতে জীবনে হতোদ্যম হয়ে নিজের দুঃখের জন্য ভগবানকে বা অপর কাউকে দোষারোপ করেই কাল কাটায়; কেউ বা দুঃখের চাপে অধীর হয়ে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে চুরি, ডাকাতি, ছল-চাতুরীর আশ্রয় নেয়। শুধু বিরল কিছু সাহসী ও শক্তিমান মানুষ এই দুঃখরূপ সত্যের কারণ খুঁজে বার করতে প্রয়াসী হন এবং তাঁদের মধ্যেও বিরল ও মুষ্টিমেয় কয়েকজন বুঝতে পারেন যে, যেহেতু দুঃখ আসে ও যায়, সুতরাং তার হানি বা তার থেকে মুক্তি আছে এবং আরও বড়ো কথা, সেই হানোপায় বা মুক্তির পথও আছে।

ভগবান বুদ্ধ হলেন এই বিরলতম শ্রেণির এক মানুষ। তিনিই প্রথম জীবনের গভীরে অনুসন্ধান করে খুঁজে বার করেন এই চতুঃসূত্রী সত্য—জগতে দুঃখ আছে, দুঃখের কারণ আছে, দুঃখের হানিও আছে, আর দুঃখকে দূর করার উপায়ও আছে। অথচ আশ্চর্যের কথা এই যে, বুদ্ধের পিতা রাজা শুদ্ধোদন যখন পুত্রের জন্মপত্রিকা ঘেঁটে জানতে পারলেন, পুত্রের রাজচক্রবর্তী অথবা তীব্র বৈরাগ্যমণ্ডিত সন্ন্যাসী—এই দুয়েরই যোগ আছে, তখন তিনি রাজ্য থেকে যাবতীয় দুঃখজনক অভিজ্ঞতাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে এতটুকু কার্পণ্য করলেন না। হায় রে অবোধ পিতৃস্নেহ! যে-অমোঘ সত্যকে যুগ যুগ ধরে কেউ প্রতিহত করতে পারেনি, এক সীমিত ভূখণ্ডের রাজা কেমন করে সেই সত্যকে নিজের পুত্রের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখবেন? তাকে জীবনে বড়ো হতে গেলে যে অনিবার্যভাবে দুঃখ নামের বস্তুটির সামনে এসে দাঁড়াতেই হবে সাহসভরে! এযুগেও দেখি নরেন্দ্রনাথ থেকে বিবেকানন্দে উত্তরণ ঘটাবার জন্য স্বয়ং জগন্মাতা তাঁর প্রিয় সন্তান নরেন্দ্রনাথকে চরম দারিদ্র্য ও সংসারের যাবতীয় দুঃখের মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়ে ভারতাত্মার প্রাণস্পন্দনের কেন্দ্রকে চিনতে শিখিয়েছেন। ভগবান বুদ্ধের ক্ষেত্রেও অনিবার্যভাবে

তাই ঘটল। এই দুঃখের আগমনকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটিয়ে কখনও রোখা যায় না।

দুঃখ অনেকরকম আছে—প্রিয় বস্তু হারানোর দুঃখ, কেউ কটু কথা বলায় দুঃখ, প্রতিযোগিতায় হেরে যাওয়ার দুঃখ, আরও কত কী! তবে এই দুঃখগুলি মানুষের ব্যক্তিত্বের গভীরে বিশেষ স্পর্শ করে না। আর এক ধরনের দুঃখ আছে, যা মানুষের অস্তিত্বের মূলে গিয়ে নাড়া দেয়, অস্তিত্বকে সংকটে ফেলে দেয়; সেই দুঃখ আরও গভীর স্তরের। বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হয়েছিল মূলত এই অস্তিত্বের সমস্যার সমাধান করতে। তাই ছোটোবেলায় খুড়তুতো ভাই দেবদত্তের বাণে বিদ্ধ হাঁসটি যখন গৌতমের কোলে এসে পড়ল, তিনি সেই বাণের উৎস না খুঁজে বা কেন বাণটি মারা হল, তা খতিয়ে না দেখে প্রাথমিক চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় হাঁসটির প্রাণ বাঁচালেন। ঘটনাটিতে এখানেই পূর্ণচ্ছেদ পড়ল না। হাঁসটির দাবিদার হয়ে আবির্ভাব ঘটল দেবদত্তের। গৌতম কিন্তু শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন ভাইয়ের দাবি। যুক্তি দিলেন—ঘাতকের নয়, রক্ষকেরই দাবি থাকে আহত, দুর্বল প্রাণীর ওপর। এই ঘটনাটি বুদ্ধের জীবনের এক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, যার ওপর তাঁর জীবনদর্শন তথা উপদেশ দাঁড়িয়ে রয়েছে। এর তাৎপর্য হল, জগতের দুঃখনিপীড়িত মানুষকে দেখে অযথা এক অদৃশ্য নিয়ন্তা ঈশ্বরের ওপর সব দোষ চাপিয়ো না, বা কেঁদে কেঁদে তাঁকে ডাকতে বোসো না; ওটা দুর্বল মানুষের লক্ষণ। নিজের পৌরুষের, অন্তর্নিহিত শক্তির আশ্রয় নাও। কারও হাত কেটে গেলে সেবা ও শুশ্রূষা দিয়ে তাকে আগে সুস্থ করে তোলো, তারপর সময় থাকলে কী করে হাত কাটল, কে এর জন্য দায়ী, বা এরপর কী হবে, ওইসব বিচার নিয়ে মাথা ঘামিয়ো।

বুদ্ধের আবির্ভাবের কারণ

বৈদিক ভারতে কর্মকাণ্ডের উদ্ভব হয়েছিল সাধারণ মানুষকে ধাপে ধাপে ত্যাগের সিঁড়িতে পা রেখে আধ্যাত্মিকতার শিখরে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। বড়ো কিছু পেতে হলে ছোটোখাটো বস্তুগুলি ত্যাগ করা দরকার; তাই যজ্ঞরূপ কর্মকাণ্ডের প্রবর্তন করেন ঋষিরা। আর যজ্ঞে পুরোহিতের উপস্থিতি অপরিহার্য, তাই পরবর্তী কালে ওই যজ্ঞরূপ ত্যাগের ধর্মই পুরোহিততন্ত্রে পর্যবসিত হয়ে পুরোহিতকুলকে স্বার্থান্বেষী, লোভী ও সুবিধাবাদী করে তুলল। তারা মানুষকে বুঝিয়ে দিল, ঈশ্বরের কাছে যেতে হলে পুরোহিতের কাছ থেকে ছাড়পত্র নিয়েই যাওয়া সম্ভব, অর্থাৎ মানুষ পুরোহিতের পদতলে নিজেদের সর্বস্ব সমর্পণ করুক। আর মানুষও নিজেরই অজান্তে ধীরে ধীরে পুরোহিতকুলের ক্রীড়াপুত্তলিকায় পরিণত হল। তারা নিজেদের যাবতীয় কৃতকর্মের ফল ধনদৌলতের বিনিময়ে পুরোহিতদের ঘাড়ে চাপিয়ে ভাবল, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। কিন্তু এর অদৃশ্য ফলরূপে তারা যে নিজেদের পুরুষকারকে পঙ্গু করে তুলল, তা কারও চোখে পড়ল না। অপরদিকে পুরোহিতের দল নিজেদের ক্ষমতার সীমানা বাড়াতে বাড়াতে ইচ্ছামতো আইনকানুন গড়তে ও ভাঙতে লাগল, আর মানুষের অন্তরের সুপ্ত শক্তিকে কলা দেখিয়ে তাদের উচ্চতর সত্য থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে রাখল। মানুষও সংকটে পড়লে ঈশ্বর নামে এক অদৃশ্য বস্তুর ওপর সব দায়ভার চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে লাগল। আবার এই পুরোহিততন্ত্র থেকেই ধর্মের নামে মারামারি কাটাকাটির সূত্রপাত হল। মানুষ ভগবানকে ভালোবাসার নামে অপরকে লুণ্ঠন, জীবহত্যা ইত্যাদি নারকীয় প্রবৃত্তিতে মেতে উঠল।

সাম্যবাদের প্রচারক, মানবপ্রেমে ভরপুর, উদার ও বিশাল হৃদয়ের অধিকারী ভগবান বুদ্ধ অপরের ওপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টাকে প্রশ্রয় দিতেন না। চাইতেন আত্মবিশ্বাসী ও স্বনির্ভর হয়ে মানুষ নিজের দায়ভার নিজে বহন করে জীবনের পথে এগিয়ে চলুক। কী দরকার সেই ঈশ্বরের, যিনি একজনকে সুখী, অপরজনকে দুঃখী করে স্বর্গে বসে মজা দেখে চলেছেন? দুঃখের কারণ জেনে তার পারে যাওয়ার চেষ্টা বা নিঃস্বার্থভাবে অপরের দুঃখ দূর করার চেষ্টাকে তিনি অধিকতর মঙ্গলজনক ভেবেছেন। পক্ষপাতদুষ্ট দেবতাদের সন্তুষ্ট করতে অবলা পশুর জীবন বলি দেওয়া নিরর্থক। অপরের জন্য স্বার্থত্যাগ ও পরোপকারের অভ্যাস করতে করতে সব দুঃখের মূল

যে অহংকার, তা খর্ব হয়ে গেলে মানুষ চিরশাশ্বত, ইন্দ্রিয়াতীত সুখের সন্ধান পাবে।

তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাবলি ও বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি

মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। গৌতম যৌবনে পদার্পণ করলে পিতা তাঁর বিবাহ দিয়ে তাঁকে সংসারে বেঁধে রাখতে চাইলেন। অত্যন্ত সুন্দরী যৌবনবতী স্ত্রী, লাস্যময়ী ললনারা, রাজপ্রাসাদের বিলাসিতা, এসব কিছুই কিন্তু গৌতমকে দুঃখের অভিজ্ঞতা থেকে সরিয়ে রাখতে পারল না। কারণ বিগত পাঁচশোটি জীবনে যিনি তিল তিল করে অপরের হিতে নিজেকে উৎসর্গ করে গেছেন, একমাত্র তিনিই মানুষের যাবতীয় ক্লেশে উপযুক্ত বৈদ্যের ভূমিকা নিয়ে মলম লাগাতে পারেন। তাই কতগুলি ঘটনা ঘটার প্রয়োজন ছিল গৌতমের জীবনে। সেই ঘটনাগুলি হল, গৌতমের নগরভ্রমণের সময় সংসারের তিনটি অত্যন্ত রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি হওয়া—ব্যাধি, জরা ও মৃত্যু। এগুলিকে আজ পর্যন্ত কোনও জীবই এড়াতে পারেনি। আর এই দুঃখগুলি মানুষের অস্তিত্বের মূলে আঘাত হানে, তার চিরশাশ্বত, নিত্য ও মুক্ত আত্মাকে বিনাশের ভয় দেখায়। তাই সারথি ছন্দক বললেন, এগুলি থেকে কারও মুক্তি নেই। রাজা শুদ্ধোদন আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এনে প্রজাদের দারিদ্র্য দূর করতে সফল হলেও এই ভয়ংকর অস্তিত্বমূলক সমস্যাকে তিনি প্রাণাধিক প্রিয়পুত্র গৌতমের দৃষ্টিপথ থেকে সরাতে পারেননি। দৃশ্যগুলি দেখে ও ছন্দকের ব্যাখ্যা শুনে মর্মাহত গৌতম গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। বহুকালের প্রতীক্ষিত সেই মাহেন্দ্রক্ষণ যেন এগিয়ে এল। গৌতমের মনে হল, তাহলে কি কিছু কিছু দুঃখের কোনও সমাধান বা তার থেকে ত্রাণ নেই? আছে, আছে, সব সমস্যারই সমাধান আছে। চতুর্থবার নগরভ্রমণকালে দেখা মিলল এক সৌম্যকান্তি মুণ্ডিতমস্তক সন্ন্যাসীর। তাঁর ভাস্বর বদনই বলে দিল, এই দুঃখের পারে যাওয়ার ও শাশ্বত আনন্দের অধিকারী হওয়ার পথ আছে। গৌতম প্রকৃতি থেকে এই পাঠ নিলেন। জগতের দুঃখে যাঁর হৃদয় মথিত হচ্ছে, তিনি পথ খুঁজে বার করতে পথেই নামলেন অবশেষে। এই পথ স্বারাজ্যসিদ্ধির পথ। রাজপ্রাসাদের বিলাসব্যসন, মাতাপিতার অপরিসীম স্নেহ, প্রিয়তমা পত্নীর আকর্ষণ বা সদ্যোজাত পুত্র রাহুল—কেউই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারল না সেই অনন্তের হাতছানির কাছে। এই হাতছানি বা ডাক আসে ব্যক্তির অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ থেকে, অত্যন্ত নিঃশব্দে অথচ দৃঢ়ভাবে; সংসারের কোনও কোলাহল বা উন্মত্ততা সেই নিশ্চিত ডাকের শব্দকে থামাতে পারে না। এই ডাক যার কাছে আসে, একমাত্র সে-ই বোঝে, আর তার দুর্নিবার আকর্ষণে সংসারের সবকিছু পায়ে ঠেলে এগিয়ে যায়; কেবল নক্ষত্রখচিত রাতের আকাশ তার যাত্রাপথের দিকে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে। ঠিক সেইভাবেই আঁধার রাতে নিঃশব্দে গৌতম সংসারত্যাগ করে চললেন, পথে এক ভিক্ষুকের কাছ থেকে নিজের মহামূল্য রাজপোশাকের বিনিময়ে তার চীরবস্ত্র চেয়ে নিলেন, নদীর জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে নিজেই দীর্ঘ কেশ মুণ্ডন করে নিলেন। তারপর তাঁর আন্তররাজ্যে পরিব্রাজন শুরু হল। তপস্যা কঠোর থেকে কঠোরতর হতে লাগল। কয়েকজন তাঁর তপোময় জীবনে অনুপ্রাণিত হয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। কিন্তু বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির তখনও অনেক বাকি। তিনি বুঝলেন, চরমপন্থা অবলম্বন করে শরীরকে শোষণ করে কোনও লাভ হবে না। কঙ্কালসার শরীরে শেষপর্যন্ত তিনি সুজাতা নামে এক ভক্তিমতী নারীর আনা পরমান্ন খেয়ে উপবাস ভঙ্গ করলেন। তারপর গয়ায় সেই বিখ্যাত বোধিবৃক্ষের নিচে বসে জীবনের কঠিনতম প্রতিজ্ঞাটি উচ্চারণ করলেন : ''ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং/ ত্বগস্থি মাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।/ অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং/ নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥''—বোধি লাভ না করা পর্যন্ত এই আসন থেকে আমার শরীর নড়বে না, তাতে শরীর শুকিয়ে যাক, চামড়া, হাড়, মাংস সবকিছুই বিনষ্ট হয়ে যাক। এটি আধ্যাত্মিক জীবনের এক চরম পদক্ষেপ। সামনে পিছনে আঁধার, কোথায় চলেছি জানি না, কোনও নিশ্চয়তা নেই, তবু হাল ছাড়ব না আমি, যতদিন না হাড়মাংস পর্যন্ত ধ্বংস হচ্ছে। স্বর্গের দেবতারা চঞ্চল হয়ে উঠলেন, অন্তরিক্ষ ও অন্যান্য লোকবাসীও অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করতে লাগলেন

মর্ত্যের সেই পুরুষসিংহকে। তিনি আসনে বসে ধ্যানস্থ হলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই 'মার' বা মায়া তার রূপের পসরা সাজিয়ে এল যোগীর ধ্যানভঙ্গ করতে, কিন্তু লোভ, ভয় ইত্যাদি কোনও কিছুই সেই যোগীকে নিজের পণ থেকে টলাতে পারল না। অবশেষে দীর্ঘপ্রতীক্ষিত সেই ক্ষণটি এল যখন সিদ্ধার্থ গৌতম শুককীটের প্রজাপতিতে রূপান্তরের মতোই পরিণত হলেন বুদ্ধে। তিথিটি ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা—গৌতমের জন্মতিথিও বটে। স্বর্গের দেবতারা জয়ধ্বনি, পুষ্পবৃষ্টি করলেন। চারিদিকে 'ধন্য ধন্য' রব উঠল। বুদ্ধ সিদ্ধাসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন। মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে তাঁর সাধনা পূর্ণ হল। চরম সত্যকে উপলব্ধি করে তিনি অভয় হলেন, জগতের যাবতীয় দুঃখের সমাধান খুঁজে পেলেন। শোনালেন তাঁর অমৃতময় বাণী। বললেন, সমস্ত দুঃখের কারণ হল তন্‌হা বা তৃষ্ণা, এবং তা নিবৃত্ত হলেই মানুষ নির্বাণলাভ করবে—সব দুঃখের পারে যেতে পারবে—এ জন্মেই। এই তৃষ্ণাজয়ের পথকে তিনি আটটি অঙ্গে ভাগ করে বললেন—সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্ম, সম্যক্ জীবিকা, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি—এগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে অভ্যাস করলে মানুষ তৃষ্ণাকে জয় করতে পারবে।

বুদ্ধের অবদান—কিছু সমালোচনা

বুদ্ধদেব সম্বন্ধে কতগুলি ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। তাদের মধ্যে প্রথম, তিনি বেদের প্রাধান্য স্বীকার করেননি। আসল ঘটনা হল, তিনি কর্মকাণ্ডময় বেদকে স্বীকার করেননি এবং তা এইজন্য যে, তাঁর আবির্ভাবের আগে থেকেই ভারতে বেদের কর্মকাণ্ডকে নিয়ে বীভৎস স্বার্থপরতা ও ভোগসর্বস্বতা রূপ নিচ্ছিল। আর সেই রূপ এতই বিকৃত যে ত্যাগের আদর্শে ঘাটতি পড়ে যাচ্ছিল, আর মানুষের লোভ ও ভোগস্পৃহা মেটাতে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে বহু ইতর জীব প্রাণ হারাতে বসেছিল। বুদ্ধ কিন্তু বেদের জ্ঞানমার্গে শুধু নির্বাণই লাভ করলেন না, উপরন্তু সেই দুর্লভ অভিজ্ঞতা করায়ত্ত করার পর শরীর বিসর্জন না দিয়ে নিম্নতর ভূমিতে নেমে এসে ইতরসাধারণ মানুষকে মুক্তি বা নির্বাণের পথ দেখাতে লাগলেন। এই অবস্থাটির নাম বোধিসত্ত্বভূমি। এই অবস্থা তিনি নিজে লাভ করার পর তাঁর করুণা এমন অসীম হয়েছিল যে, এক রাজা যজ্ঞে বলির জন্য যে-ছাগশিশুটি বেঁধে রেখেছিলেন, বুদ্ধ সেটির প্রাণের বিনিময়ে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে রাজি হন। তারপর থেকে সেই রাজ্যে পশুবলি চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

এই বোধিসত্ত্ব অবস্থাটি বেদান্তে উল্লিখিত জীবন্মুক্ত অবস্থার সঙ্গে তুলনীয়। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণও ঈশ্বরকোটি বা অবতার কথার মাধ্যমে একই অবস্থা বর্ণনা করেছেন। তাঁর 'ভাবমুখে' থাকার বর্ণনা, তিন বন্ধুর মধ্যে তৃতীয় জনের মানবদরদি ভাববশত প্রাচীরের ওপারের আনন্দমেলার খবর ফিরে এসে অন্যদের শোনানো ইত্যাদি ওই বোধিসত্ত্ব অবস্থারই আর এক প্রকাশ।

বুদ্ধের বিষয়ে অপর ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণাটি হল, তিনি ঈশ্বর মানতেন না, শূন্যবাদী ছিলেন ইত্যাদি। আসলে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে হ্যাঁ বা না কিছুই বলেননি। অর্থাৎ তাঁর মতে ভগবান অস্তি-নাস্তির পার, যা হল সম্পূর্ণ বেদান্তের মত। আর শূন্য বলতে সাধারণত যা বোঝায়, শূন্যবাদীরা তা বলেন না; আসলে 'শূন্য' কথাটা বলতে গেলেই শব্দের দ্বারা বলতে হয়, প্রকৃত আত্মা বা ব্রহ্ম শব্দের অতীত। তিনি ঈশ্বরকে মানতেন না, একথা অনেকে বললেও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু বুদ্ধদেব সম্বন্ধে মোটেই ওই মত পোষণ করতেন না। একজন অবতারই অপর অবতারকে সঠিক বুঝতে পারেন। কথামৃতে পাই, ভক্তদের মধ্যে কেউ বুদ্ধদেবকে নাস্তিক বলায় ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে বলেন—তিনি আসলে অস্তি-নাস্তির পারে গিয়েছিলেন, তাই ভগবান আছেন বা নেই এসব কোনও মন্তব্যই করেননি। তাছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বুদ্ধদেবকে অবতার বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

ধর্মগুরুদের সঙ্গে পুরোহিতদের বিরোধ চিরন্তন। ধর্মগুরুরা তত্ত্বদর্শী, তাই তাঁরা প্রকৃত সত্যকে কোনও চাকচিক্যের মোড়কে না বেঁধে সরাসরি প্রচার করেন। এতে পুরোহিতদের স্বার্থে ঘা পড়ে, কারণ শুদ্ধ সত্যকে প্রচার করলে সাধারণ মানুষের পায়ে আর শিকল বেঁধে

রাখা যাবে না। তাতে মানুষের মন থেকে নরকের বা পাপের শাস্তির ভয় চিরতরে দূর হয়ে যাবে এবং স্বভাবতই পুরোহিতদের অস্তিত্ব বজায় রাখা দুষ্কর হয়ে পড়বে। কিন্তু আসল কথা হল, সত্য যতই রূঢ় বা নির্মম হোক, তাকে জানা দরকার। সত্যের তন্ত্রী খুব উচ্চগ্রামে বাঁধা থাকলেও মিথ্যার সঙ্গে আপস করা মানেই নিজের পায়ে দাসত্বের শৃঙ্খল পরা।

ভগবান বুদ্ধ প্রকৃত তত্ত্বদর্শী ছিলেন, তাই তিনি পুরোহিতদের প্রবর্তিত অযৌক্তিক কর্মকাণ্ডকে নির্দ্বিধায় মেনে নিতে পারেননি। তিনি শুধু বললেন, কর্মের জন্যই কর্ম করে যাও—কোনও ইষ্টসিদ্ধির উদ্দেশ্যে নয়। তবেই তোমরা নিঃস্বার্থ হয়ে উঠবে, আর জগৎ উপকৃত হবে তাতে।

বুদ্ধের ধর্মে ঈশ্বর নামক অদৃশ্য বস্তুটির কোনও স্থান নেই বটে, তবু বৌদ্ধধর্ম সারা পৃথিবীতে অভূতপূর্বভাবে প্রসার লাভ করেছে। তার একমাত্র কারণ বুদ্ধের অপার্থিব মানবপ্রেম, যার বলে বলীয়ান হলে ধর্মের দোহাই দিয়ে একে অপরের গলা কাটা বন্ধ হবে—''হিংসা যেদিন যাইবে দুনিয়া ছাড়ি, সব তরবারি হইবে সেদিন কাষ্ঠের তরবারি!'' এই গভীর মানবপ্রেমের বার্তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে বুদ্ধের শিষ্যেরা তাঁরই নির্দেশে সুদূর প্রাচ্য, মধ্যপ্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান ও ধর্মপ্রচার করেন। তিব্বত, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, চীন, কোরিয়া, থাইল্যান্ড, জাপান, পারস্য, এশিয়া মাইনর, রাশিয়া, পোল্যান্ড, ইউরোপ ইত্যাদি দেশে বৌদ্ধভিক্ষুরা যেভাবে ধর্মপ্রচার করেছেন, তার সুস্পষ্ট ছাপ আজও পাওয়া যায়। সেখানকার মানুষ নিজেদের সামাজিক জীবনধারার সঙ্গে বৌদ্ধধর্মকে ওতপ্রোত করে নিয়েছে, এমনকি চীনের কনফুশিয়াসের ধর্মেও বৌদ্ধ ভাবধারা যথোপযুক্ত স্থান পেয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দ বৌদ্ধধর্মকে হিন্দুধর্মের 'rebel child' বা বিদ্রোহী সন্তান বলেছেন। কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। হিন্দুধর্মের মধ্যে জন্ম নিলেও বৌদ্ধধর্ম ছিল সংস্কারমূলক। ওই ধর্মসংস্কারকে স্থাপন করতে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম শুধু সংশোধনের পথ বেছে নেয়, ফলে বৌদ্ধধর্মের মধ্যে নাস্তিবাচক শিক্ষা মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব পেয়ে যায়। যেমন, বৌদ্ধধর্ম প্রচার করল—জগতে সবকিছুই দুঃখময় ভ্রান্তিস্বরূপ, সুতরাং তার পারে যাও। অপরদিকে হিন্দুধর্ম চিরকাল সগর্বে প্রচার করে এসেছে যে, জগৎ ভ্রান্তিময় হলেও তার একটা চিরশাশ্বত আধার বা আশ্রয় হলেন ব্রহ্ম বা ভগবান; অর্থাৎ ভ্রান্তিও ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত। তারপর বুদ্ধ বললেন, সন্ন্যাসগ্রহণ করলে তবেই এই দুঃখময় জগতকে জয় করা যায়। হিন্দুধর্ম বলেন, তা বটে, কিন্তু সন্ন্যাসই একমাত্র পথ নয়, আদর্শ গৃহীর জীবনও মানুষকে আধ্যাত্মিকতার শিখরে নিয়ে যেতে সমর্থ। দৃষ্টান্তস্বরূপ তপস্বী, গৃহবধূ ও ধর্মব্যাধের কাহিনি আছে, আবার বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র প্রমুখ গৃহস্থ ঋষিদের কথাও আছে। তবে শুধুমাত্র নাস্তিত্বমূলক ভাব কোনও ধর্মকে সাংগঠনিক প্রেরণা দিতে পারে না, কারণ নেতিভাবের প্রকোপে অস্তিত্বের ভাব চাপা পড়ে যায়। তাই ভগবান বুদ্ধ অসীম সাহস ও হৃদয়বত্তার সঙ্গে যাগযজ্ঞসর্বস্ব ভারতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনলেও বৌদ্ধধর্মের উপজাতকরূপে (by-product) উৎপন্ন হওয়া বিনাশমূলক ভাব ভারতীয় ধর্মে স্থায়ী আসন পাততে পারেনি, ভারত ওই ভাবগুলিকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

সঙ্ঘের প্রবর্তন—বিদেশে ধর্মপ্রচার

বুদ্ধদেব সমাধি থেকে নেমে এসে সন্ন্যাসীদের সঙ্ঘবদ্ধ করলেন এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে শিষ্যদের দিকে দিকে পাঠিয়ে দিলেন 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার উদ্দেশ্যে। সাংগঠনিকভাবে বিশ্বের কোণে কোণে ধর্মপ্রচারের পথটির তিনিই হলেন পথিকৃৎ। তিনিই প্রথম বলেন, একটি ক্ষুদ্র কীটেরও মুক্তির জন্য তিনি হাজারবার জন্ম নিতে রাজি। এই হল বোধিসত্ত্বের আদর্শ। গীতার বাণীর মূর্ত রূপ এই শাক্যসিংহ ভগবান বুদ্ধ। তাঁর চরিত্র অনুধ্যান করলে গীতার শ্লোকগুলির অর্থ পরিষ্কার হয়ে যায়। যেমন, ''ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।/ নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥''—যাঁদের মন সাম্যে স্থিত, তাঁরা এই জন্মেই সংসার জয় করেছেন। ব্রহ্ম সমভাবাপন্ন ও নির্দোষ, তাই এমন মানুষেরা ব্রহ্মেই

স্থিত। আবার, ''সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।/ ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥''—ঈশ্বরকে সর্বত্র একইভাবে দর্শনের ফলে এরকম মানুষ কখনও নিজে নিজেকে হিংসা করতে পারেন না।

শেষোক্ত এই ভাবের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বুদ্ধের অহিংসার বাণী, যা ছিল তাঁর স্থাপিত সঙ্ঘের মূলমন্ত্র। তাঁর বাণীর মূল কথা হল—ক্রোধকে ক্রোধ দিয়ে নয়, ভালোবাসা দিয়ে জয় করতে হয়; শত্রুকে মিত্রভাব দিয়ে জয় করতে হয়; অসাধুতাকে সাধুতার মাধ্যমে, কৃপণকে দানের মাধ্যমে জয় করতে হয়। সকলকেই নির্বাণ লাভ করতে হবে। যেমন প্রজ্বলিত এক দীপ থেকে আরও অনেক দীপ জ্বালানো যায়, সেইভাবে প্রত্যেককে আত্মদীপ হয়ে—নিজে জ্বলে উঠে অপরকে পথ দেখাতে হবে, আলো জ্বালাতে হবে। ভগবানলাভ বা সত্যবস্তু লাভের প্রসঙ্গ কেউ তুললে তিনি সর্বদা বলতেন, ''কায়মনোবাক্যে সৎ হও, পবিত্র হও, অপরকে ভালোবাসো, তাহলেই তুমি তাঁর সান্নিধ্যে পৌঁছাতে পারবে। তর্ক করে বা একে অপরকে আক্রমণ করে সত্যলাভ সম্ভব হয় না।'' বুদ্ধদেবের একটি অনবদ্য অবদান হল জাতিভেদপ্রথার উচ্ছেদ এবং আর একটি অবদান হল ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর নানা দেশে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের পাঠানো। নিজের চল্লিশজন শিষ্যকে তিনি আদেশ দেন—সাম্য, মৈত্রী ও কল্যাণের বাণী নিয়ে নগ্নপদে দেশে দেশে ভ্রমণ করে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে মানুষকে শান্তির বাণী শোনাতে, আর নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করতে। তিনি শিষ্যদের বলতেন, ''কোনও শাস্ত্র যতই প্রাচীন বা বহুজনসমর্থিত হোক, নিজের জীবনে যাচাই না করে কখনো মেনে নিয়ো না। তবে যদি সেই শাস্ত্রের বাণী বহুজনের হিতকর হবে বলে মনে হয়, তাহলে নিশ্চয় তা গ্রহণ করবে।'' তিনি আরও বলতেন, ''স্বার্থপরতা এক প্রচণ্ড অভিশাপ। তাই নিজের শুভশক্তিতে বিশ্বাস করে উঠে দাঁড়াও, কোনওরকম স্বার্থসিদ্ধির ভাব না রেখে, শাস্তির ভয়ে কুণ্ঠিত না হয়ে, এমনকি স্বর্গ বা কোনও আকাঙ্ক্ষিত লোকে যাওয়ার উদ্দেশ্য না রেখে, শুধু পরোপকারের উদ্দেশ্যেই সৎকাজ করে যাও।'' বৌদ্ধধর্মই পৃথিবীর একমাত্র ধর্ম যা রক্তপাত না করেই দূরদূরান্তরে প্রচারিত হয়েছিল। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ই ভারতের প্রথম গোষ্ঠীবদ্ধ ধর্মসম্প্রদায়। বৌদ্ধধর্মের ত্রিপুটী হলেন বুদ্ধ, তাঁর ধর্ম, ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘ।

ভগবান তথাগতের আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে হাজার হাজার মানুষ সঙ্ঘের শরণ নিল, শান্তির পথ খুঁজে পেল। তাঁর সন্ন্যাসী শিষ্যেরা তাঁর নির্দেশে দিকে দিকে বুদ্ধের শান্তির বাণী নিয়ে ছড়িয়ে পড়ল। বুদ্ধই প্রথম ভারতের ধর্মকে তার রাজ্যসীমার বাইরে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন। সারা বিশ্ব অবাক বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধাবনতচিত্তে তাঁর শান্তির বাণী গ্রহণ করেছিল।

হৃদয়বত্তার দিক দিয়েও এই অবতারটির কোনও তুলনাই হয় না। আশি বছর বয়সে জীবনসন্ধ্যায় এক শূদ্রের আমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করেন এবং অপর সকলের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও সেই শূদ্রের নিবেদিত নিষিদ্ধ ভোজন গ্রহণ করেন; তাঁর অপাপবিদ্ধ শরীর এর ফল সইতে পারে না, তিনি শূলবেদনায় শেষ শয্যা গ্রহণ করেন। কিন্তু ওই বেদনাদগ্ধ অবস্থাতেও তিনি কারও নিষেধ না শুনে দূরাগত শরণার্থীকে উপদেশ দিয়ে কৃতার্থ করতে থাকেন অক্লান্তভাবে। শিষ্যেরা আপত্তি করলে বলেন, ''এ দেহ যখন যাবেই, যত বেশি জনকে সাহায্য করতে পারি, করে যাই।'' অবশেষে চিরবিদায়ের পরম লগ্ন এগিয়ে এলে তিনি শায়িত অবস্থায় শিষ্যবর্গকে ডেকে বললেন, ''দুঃখ কোরো না। বুদ্ধ কোনও মানুষ নয়, একটি অবস্থার নাম। তোমরা সকলে নিজের অন্তরের দীপ জ্বালিয়ে সেই অবস্থায় ওঠো আর সকলকে জাগিয়ে তোলো।'' শিষ্যেরা জয়ধ্বনি করে ওঠেন : ''বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।''

কবি জয়দেবরচিত দশাবতারস্তোত্র থেকে বুদ্ধদেবের উদ্দেশে নিবেদিত স্তবকটি উদ্ধৃত করে আলোচনার উপসংহার করি : ''নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং/ সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতং/ কেশবধৃত-বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে।''✠